নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ করতে হবে

মো. সিরাজুল হক

করোনাভাইরাসজনিত রোগ কোভিড-১৯ এর কারণে নারী ও শিশুর ওপর নির্যাতন ও অত্যাচার বিশ্বব্যাপী বেড়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে শিশুরা সহিংসতার শিকার হচ্ছে বেশি। কন্যা শিশুরা বাল্যবিয়ের শিকার হচ্ছে। প্রতিবছর ব্যাপক সংখ্যক কন্যাশিশুর ভ্রূণ নষ্ট করা হচ্ছে, যা মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন। এখন নারীর প্রতি সহিংসতার কোনো সামাজিক বা জাতীয় সীমারেখা নেই। বিশ্বজুড়ে আনুমানিক প্রতি তিনজন নারীর মধ্যে একজন জীবনের কোনো না কোনো সময় শারীরিক অথবা যৌন নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকেন। নারীর প্রতি সহিংসতা ব্যক্তি, পরিবার এবং সমাজে দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলে।

সহিংসতার শিকার নারীদের মানসিক স্বাস্থ্য, মর্যাদা, নিরাপত্তাবোধ এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হয়। অনেক ক্ষেত্রে তারা গুরুতর প্রজননস্বাস্থ্য সমস্যায় আক্রান্ত হয়। এর মধ্যে অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণ, অনিরাপদ গর্ভপাত, ফিস্টুলা, এইচআইভিসহ যৌনবাহিত নানারোগের সংক্রমণ। এ ছাড়া সহিংসতার কারণে নারীর মৃত্যু পর্যন্ত হয়ে থাকে। নারী ও অল্পবয়সী মেয়েদের ওপর নিপীড়নের অন্যতম কারণ বাল্যবিবাহ। বাল্যবিবাহের কারণে বিশ্বব্যাপী বিপুল সংখ্যক কন্যাশিশুর জীবন ঝুঁকির মধ্যে পড়ে।

জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে বিশ্বব্যাপী নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা রোধে জোরালো পদক্ষেপ নেয়ার কথা বলা হয়েছে। জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলো নারীর প্রতি সহিংসতা নির্মূলকরণে কয়েকটি বিষয়ে একমত হয়েছে। এর মধ্যে তৃতীয়, পঞ্চম ও ষোড়শ লক্ষ্য উল্লেখযোগ্য। তৃতীয় লক্ষ্য: সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ; পঞ্চম লক্ষ্য: নারী-পুরুষের সমতা: নারী ও শিশুদের অধিকার রক্ষা, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অশংগ্রহণ ও ভূমিকার মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন তথা সক্ষমতা নিশ্চিত করা এবং ষোড়শ লক্ষ্য: শান্তিপূর্ণ ও ন্যায়বিচার কার্যক্রম প্রতিষ্ঠা, টেকসই উন্নয়ন সংক্রান্ত বাস্তবধর্মী প্রশিক্ষণ ও সচেতনতামূলক কাজের মাধ্যমে এমন সমাজব্যবস্থাকে উৎসাহিত করা, যেখানে ন্যায়পরায়ণতা, সুবিচার, সমঅধিকার, জবাবদিহিতা, বহুমতের প্রতি শ্রদ্ধা, সহমর্মিতা ও সরল জীবনযাপনের সামাজিক সংস্কৃতি গড়ে ওঠে।

সহিংসতার ঝুঁকিতে থাকা মানুষ, বিশেষ করে শিশুরা বড় হয়ে সহিংস আচরণে অভ্যস্ত হয়ে পড়তে পারে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের আগে জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলো বেশ কয়েকটি সনদ গ্রহণ করেছে, যেগুলো উন্নয়নের শর্ত হিসেবে নারী, অল্পবয়সী কন্যা এবং শিশুদের প্রতি সহিংসতা নিরসনকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এসব সনদ হচ্ছে: মানবাধিকার সনদ ১৯৪৫; নারীর প্রতি সবধরণের সহিংসতা নির্মূল নীতিমালা (সিডও) সনদ ১৯৭৯; শিশু অধিকার সনদ (সিআরসি) ১৯৯০; আন্তর্জাতিক জনসংখ্যা সম্মেলন এবং উন্নয়নের কর্মপরিকল্পনা ১৯৯৪; বেইজিং কর্মপরিকল্পনা ১৯৯৫; সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) ২০০০ এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) ২০১৫। সঠিক তথ্যের মাধ্যমে সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে নারীর প্রতি সহিংসতাকে আরও ভালোভাবে মোকাবিলার উপায় শেখাতে হবে। তাই জাতিসংঘ সব সদস্য দেশগুলোকে নারীর প্রতি সহিংসতার সূচক পরিমাপের জন্য নিয়মিত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণে কার্যকর পদ্ধতি প্রতিষ্ঠার আহবান জানিয়েছে।

নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি সহিংসতা একটি দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর সুদুরপ্রসারী নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এ ধরনের সহিংসতার অর্থনৈতিক মূল্য পরিবারের পাশাপাশি গোটা জাতিকে বহন করতে হয়। বেসরকারি সংস্থা কেয়ার বাংলাদেশ এর এক গবেষণায় দেখা গেছে, নারীর প্রতি পারিবারিক সহিংসতার মোট ব্যয় জাতীয় পর্যায়ে কমপক্ষে ১৪ হাজার ৩৫৮ কোটি টাকা। পরিবার, সম্প্রদায় এবং জাতীয় পর্যায়ে আরও বেশি বিনিয়োগ করলে নারীর প্রতি সহিংসতার নেতিবাচক প্রভাবগুলো মোকাবিলা করা সম্ভব। নারীর প্রতি সহিংসতার কারণে দারিদ্র্যের মাত্রা বাড়ে, উন্নয়নের গতি ব্যাহত হয় এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিও বাধাগ্রস্ত হয়।

যে কোনো আকস্মিক দুর্যোগ বা জরুরি অবস্থায় সবারই সমস্যা বেড়ে যায়। বিশেষ করে নারী ও শিশুদের প্রতি সহিংসতা, নির্যাতন ও নিপীড়ন কয়েকগুণ বাড়ে। করোনাকালীন দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে টিকে থাকার জন্য সবাই কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলা করছে। এ সময় নারী ও কন্যাশিশুদের নিজ পরিবারেও নির্যাতিত হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়। কখনো কখনো বাবা-মা মেয়েদের অল্পবয়সে বিয়ে দেন। যার ফলে তারা পড়াশোনার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে তাদেরকে রোজগারের জন্য শিশুশ্রমে নিযুক্ত করা হয়। আবার শিশু পাচারের ঘটনাও ঘটে।

নারীর প্রতি সহিংসতা বহুমাত্রিক এবং এটা মোকাবিলায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। এরমধ্যে সামাজিক মূল্যবোধের পরিবর্তন এবং সবার মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে সহিংসতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা খুবই জরুরি। আইনের মাধ্যমে অপরাধীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

করোনা সংক্রমণের ফলে বিশ্বব্যাপী নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা বেড়েছে। নির্যাতিতদের আইনি সুরক্ষা দিতে ২০০০ সালে সরকার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন প্রণয়ন করে। সে আইনকে ২০১৩ সালে সংশোধন করে অধিকতর কঠোর করা হয়। আইনি প্রতিকার চাইলে বিচারপ্রার্থীদের কোথায় সুবিচার পেতে পারেন, কীভাবে আইনি সুবিধা পাবেন তাও সংশোধিত নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলাদেশ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ সংশোধিত ২০১৩ অনুযায়ী যেসব অপরাধ এ আইনের অন্তর্ভুক্ত তা হলো- দহনকারী বা ক্ষয়কারী, নারী পাচার, শিশু পাচার, নারী ও শিশু অপহরণ, মুক্তিপণ আদায়, ধর্ষণ, ধর্ষণজনিত কারণে মৃত্যু, নারীর আত্মহত্যায় প্ররোচনা, যৌন নিপীড়ন, যৌতুকের জন্য মৃত্যু, ভিক্ষাবৃত্তি ইত্যাদির উদ্দেশ্যে শিশুকে অঙ্গহানি, ধর্ষণের ফলে জন্মলাভকারী শিশু সংক্রান্ত বিধান উল্লেখযোগ্য।

উল্লিখিত যে কোনো ঘটনার শিকার হলে ভিকটিম পার্শ্ববর্তী থানায় গিয়ে মামলা করতে পারেন। বিষয়টি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এজাহার হিসেবে গণ্য করলে তিনি ঘটনাটি প্রাথমিক তথ্য বিবরণী ফরমে লিপিবদ্ধ করবেন। পরে বিষয়টি সংশ্লিষ্ট এখতিয়ারসম্পন্ন হাকিম আদালতে প্রেরণ করবেন। এখতিয়ারাধীন হাকিম তা গ্রহণ করলে ওই মামলার প্রতিবেদন প্রদানের জন্য একটি তারিখ ধার্য করবেন এবং পরবর্তীতে মামলাটির পুলিশ প্রতিবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে উপযুক্ত আদালত তথা নারী ও শিশু নির্যাতন অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনালে পাঠাবেন। এরপর নারী ও শিশু নির্যাতন অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল মামলাটি বিচারের জন্য সাক্ষ্য গ্রহণের তারিখ ধার্য করলে সেই তারিখে মামলাটির বাদী ও অভিযুক্তকে আদালতের সামনে হাজির হয়ে সাক্ষ্য দিতে হবে এবং মামলার পরবর্তী কার্যক্রম চলতে থাকবে।

দেশের প্রতিটি জেলায় একটি করে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল রয়েছে, এখতিয়ার সম্পন্ন বিচারক দ্বারা ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রম চলমান আছে। এই আইনে ট্রাইব্যুনাল রুদ্ধদ্বার কক্ষে বিচার করতে পারেন আবার কোনো ব্যক্তির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উপযুক্ত মনে করলে বিচারক শুধু মামলার দুই পক্ষকে এবং তাদের নিয়োজিত আইনজীবীদের নিয়ে বিচার পরিচালনা করতে পারেন। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের মামলায় বাদী নিজস্ব কোনো আইনজীবী নিয়োগের প্রয়োজন নেই। ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৯২ ধারা অনুযায়ী তিনি সরকারের পক্ষ থেকে আইনজীবী পাবেন। তিনিই মামলার সব তত্ত্বাবধান করবেন। সরকারের পক্ষ থেকে নিয়োগ দেওয়া আইনজীবীকে কোনো খরচ দিতে হবে না। অর্থাৎ ভিকটিমকে কোনো অর্থ খরচ করতে হবে না। বাংলাদেশ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন সংশোধিত ২০১৩ অনুযায়ী অপরাধ প্রমাণিত হলে অপরাধীর সর্বোচ্চ শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড থেকে মৃত্যুদণ্ডও হতে পারে। এ ছাড়া রয়েছে অর্থদণ্ডের বিধান।

নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে সরকার আন্তরিকভাবে কাজ করছে। মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়, ইউএনএফপিএসহ বিভিন্ন দেশি ও আন্তর্জাতিক সংস্থা দায়িত্ব এ কাজে শামিল হয়েছে। তবে নারীর প্রতি সহিংসতা অগ্রহণযোগ্য, এটা পরিবর্তনের জন্য সামাজিক মূল্যবোধ বদলাতেই হবে। এ জন্য পুরুষের সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রয়োজন। পুরুষেরাই নারীর পাশে দাঁড়াবেন এবং নারীর প্রতি সহিংসতার বিরুদ্ধে কথা বলবেন তাহলেই নারীদের সুরক্ষা নিশ্চিত হবে। তরুণ জনগোষ্ঠীর মধ্যেই পরিবর্তনের সূচনা করতে হবে। শিশু, কিশোর-কিশোরী এবং তরুণ-তরুণীদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ এবং সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারলে শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে। আর এ কাজের সূচনা করতে হবে পরিবার থেকেই।

জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিলের (ইউএনএফপিএ) এর জরিপ অনুসারে, ২০২১ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা দাঁড়াবে ১৭ কোটিতে, যাদের ২০ শতাংশেরও বেশির বয়স থাকবে ১০ থেকে ১৯ বছরের কোটায়। যেসব সামাজিক রীতিনীতি ও চর্চা কিশোরীদের অধিকার লঙ্ঘন করে, নারীর প্রতি সহিংসতা বাড়ায় এবং তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, স্বাস্থ্য ও সামগ্রিক কল্যাণকে বাধাগ্রস্ত করে সেগুলোকে চিহ্নিত করতে সরকার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। কিশোর-কিশোরীদের প্রজননশিক্ষাসহ জীবনমুখী দক্ষতা অর্জনের প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। এর ফলে তাদের মধ্যে শ্রদ্ধা, সহিষ্ণুতা ও মানবিক মূল্যবোধ গড়ে উঠবে আশা করা যায়।

নারীর ক্ষমতায়ন, নির্যাতনের শিকার হওয়ার পর একজন নারীর প্রয়োজনীয় আইনি ও সুরক্ষা নিশ্চিত করেছে সরকার। সহিংসতার শিকার অথবা প্রত্যক্ষদর্শী হলে সহায়তার জন্য মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের হেল্পলাইনে ১০৯২১, জরুরি সেবা ৯৯৯ এবং নাগরিক সেবা ৩৩৩ নম্বরে ফোন করতে হবে। সর্বোপরি নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সচেতনতা বাড়াতে হবে।

-০০-

(পিআইডি- শিশু ও নারী উন্নয়নে সচেতনতামূলক যোগাযোগ কার্যক্রম ফিচার)